ইউনিট ৩: মাধ্যমিক শিক্ষা

ভূমিকা:

শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী ও ডিগ্রি শিক্ষার পূর্ববর্তী শিক্ষাক্রম মাধ্যমিক শিক্ষা নামে চিহ্নিত। মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষা কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর। শিক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা কৈশোর ও কৈশোরোত্তর কালের শিক্ষা। যে কোন জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যতে সমাজ গঠনের প্রধান হাতিয়ার হলো শিক্ষা ব্যবস্থা। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ গুরুত্বের নিরিখে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, মূল্যায়ন, নবতর পরিবর্তন, শিক্ষক শিক্ষা ও চ্যালেঞ্জসমূহ জানার জন্য নিম্নে উল্লেখিত সাতটি পাঠের মাধ্যমে সেগুলো উপস্থাপিত হল–

পাঠ ৩.১: মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান কাঠামো, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
Present Structure, Goals and Objectives

পাঠ ৩.২: মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রবেশ/ভর্তি, অংশগ্রহণ এবং রূপান্তর/স্থানান্তর
Access, Participation and Transition

পাঠ ৩.৩: মূল্যযাচাই ও মূল্যায়ন
Assessment and Evaluation

পাঠ ৩.৪: মাধ্যমিক শিক্ষায় নবতর পরিবর্তন বা সংযোজন
Innovations in Secondary Education

পাঠ ৩.৫: মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়ন
Planning, Management and Financing of Secondary Education

পাঠ ৩.৬: শিক্ষক শিক্ষা প্রোগ্রামসমূহ: চাকুরী পূর্ব ও চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ/কর্মপূর্ব ও কর্মকালীন প্রশিক্ষণ
Teacher Education Programs: Pre-service and In-service Training

পাঠ ৩.৭: মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান ইস্যুসমূহ এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ
Major Issues and Challenges

পাঠ ৩.১: মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান কাঠামো, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
Present Structure, Goals and Objectives

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য চিহ্নিত করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ বিবৃত করতে পারবেন।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান কাঠামো

মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে তিনটি ধারা বিদ্যমান। এ বিষয়টি বাংলাদেশের শিক্ষানীতি- ২০১০-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। শিক্ষানীতি- ২০১০ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে তিনটি ধারা থাকবে সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা ধারা এবং প্রত্যেক ধারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত রয়েছে। সব ধারাতেই জনসমতা ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে যথা– বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক রয়েছে। প্রত্যেক ধারায় এ সকল বিষয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। অবশ্য প্রত্যেক ধারায় সেই ধারা সংশ্লিষ্ট আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিভিন্ন বিষয় থাকবে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে মূলত বাংলা তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি ইংরেজি মাধ্যমেও শিক্ষা দেওয়া যাবে। বিদেশীদের জন্য সহজ বাংলা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। [সূত্র: বাংলাদেশের শিক্ষানীতি- ২০১০]

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিকভাবে দুইভাগে ভাগ করা যায়: মাধ্যমিক শিক্ষা (ষষ্ঠ শ্রেণি-দশম শ্রেণি) এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (একাদশ শ্রেণি-দ্বাদশ শ্রেণি)। মাধ্যমিক শিক্ষাকে পরবর্তীতে আরও দুটি উপ-বিভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ নিম্ন মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ - ৮ম) ও মাধ্যমিক (৯ম - ১০ম)। অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামিক পদ্ধতির শিক্ষা রয়েছে সেগুলোকে একত্রে বলা হয় মাদরাসা শিক্ষা। যেখানে "পাঁচ বছরের দাখিল" মাধ্যমিক শিক্ষার সমমান এবং দুই বছরের "আলিম" উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সমান। [সূত্র: Bangladesh Education Sector Review, P. 5]

প্রস্তাবিত বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১৬ অনুসারে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার যে কাঠামো বিবৃত হয়েছে সেটি নিম্নরূপঃ

১. মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো হবে নবম শ্রেণি থেকে শুরু হয়ে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত চার বছর বিস্তৃত।
২. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ধারাসমূহ হবে নিম্নরূপ। যথা–

ক. সাধারণ শিক্ষা;
খ. মাদরাসা শিক্ষা এবং
গ. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

ক. সাধারণ শিক্ষা

১. মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষার ধারা হবে নবম হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।
২. সুষ্ঠুভাবে পাঠদানের জন্য সরকার/কর্তৃপক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়ন সাধন করবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে।

খ. মাদরাসা শিক্ষা

১. মাদরাসা শিক্ষার মেয়াদকাল হবে দাখিল পর্যায়ে ২ (দুই) বছর এবং আলীম পর্যায়ে ২ (দুই) বছর।
২. দাখিল ও আলীম পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ, জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশ পরিচিতি এবং বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়সমূহ বাধ্যতামূলক হবে।
৩. সরকার কওমি মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও কওমি মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

গ. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

১. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক ধারার শিক্ষায় মাধ্যমিক স্তর হবে নবম হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।
২. দেশের সকল কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং শিক্ষা কার্যক্রম ও পরীক্ষা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে।
৩. জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (NTVQF)-এর আওতায় জাতীয় দক্ষতা মান- ২, ৩, ও ৪ সনদ অর্জনকারী উক্ত শিক্ষার্থীদের ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে ডিপ্লোমাসহ সমমানের অন্যান্য কোর্সে ভর্তির বিষয়টি কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।
৪. সরকার অটিস্টিকসহ সকল ধরনের শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভর্তির জন্য বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করবে।
৫. সরকার, তৃনমূল পর্যায়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা বা থানা পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ও রিসোর্স কেন্দ্র এবং টেলি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। [সূত্র: শিক্ষানীতি- ২০১৬]

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধুনিক যুগের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। নতুন শিক্ষা কাঠামোয় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এই স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ধারায় যাবে, নয়তো অর্জিত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তিতে বা আরো বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার্জনের পথে যাবে। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ–

- শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা।
- কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য, বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, একটি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীদের তৈরি করা।
- মানসম্পন্ন শিক্ষাদান করে প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষার ভিত শক্ত হবে।

- বিভিন্ন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর জন্যও যতদিন প্রয়োজন বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি সমর্থন করা।
- নির্ধারিত বিষয়ে সকল ধারায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা। [সূত্র: জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০]

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কাঠামো কত বছর পর্যন্ত বিস্তৃত?
   ক. তিন বছর
   খ. চার বছর
   গ. পাঁচ বছর
   ঘ. ছয় বছর

২. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে কাদের জন্য বিশেষ কোটার ব্যবস্থা থাকবে?
   ক. দরিদ্র শিক্ষার্থীদের
   খ. নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর
   গ. শুধুমাত্র শারীরিক প্রতিবন্ধীদের
   ঘ. অটিস্টিকসহ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের

৩. প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান কীভাবে সম্প্রসারিত ও সুদৃঢ় করা যায়?
   ক. মানসম্মত শিক্ষাদানের মাধ্যমে
   খ. বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের মাধ্যমে
   গ. প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ব্যবহারে
   ঘ. প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর বলতে কী বোঝায়?
২. প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি- ২০১৬ অনুসারে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম সংক্ষেপে লিখুন।
৩. প্রযুক্তিগত শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নির্ণয় করুন।
৪. মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য কি কি নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
২. বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো ও ধারা বিশদভাবে নিরূপণ করুন।

পাঠ ৩.২: মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রবেশ/ভর্তি, অংশগ্রহণ এবং রূপান্তর/স্থানান্তর Access, Participation and Transition

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তির হারের হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণগুলো নির্ণয় করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার কারণ সনাক্ত ও প্রতিরোধের উপায় চিহ্নিত করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক পর্যায়ে অনুপ্রবেশে অনগ্রসর অঞ্চলের শিক্ষার্থীর সুযোগ সৃষ্টির পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তি/প্রবেশ

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। এছাড়াও রয়েছে ক্যাডেট কলেজ, মাদরাসা, সরকারি স্কুল এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসমূহ। এগুলো সবই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন।

প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের প্রবেশ/ভর্তির হার পূর্বের তুলনায় বর্তমানে ক্রমবর্ধমান। একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ১৯৮৮ সালে মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির সংখ্যা ছিল ২.৮ মিলিয়ন যা ২০০৩ সালে দাড়ায় ৮.১ মিলিয়নে। নব্বইয়ের দশকে মাধ্যমিক স্তরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ছেলে শিক্ষার্থীর তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীর ভর্তির হার দ্বিগুণেরও বেশী। [সূত্র: Country Analytical Review, BANBAIS 2004]

তাছাড়া যে সব শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পাবলিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য বা উচ্চ শিক্ষা অধ্যয়নের সুযোগ বঞ্চিত সে সমস্ত শিক্ষার্থীর কারিগরি শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ রয়েছে। ব্যানবেইস ২০১৪ রিপোর্টে দেখা যায় নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজসহ মোট সংখ্যা ১৯৬৮৪টির মধ্যে মাত্র ৩২৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল- ৯১৬৩৬৫ জন। ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার যথাক্রমে ৪৬.৭৮ ও ৫৩.২২ অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির বিষয়টি বলতে গেলে পুরোটাই নির্ভর করে শিক্ষার্থীর পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উপর। শিক্ষার্থী ভর্তি/মাধ্যমিক শিক্ষায় অনুপ্রবেশ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিপরীতক্রমে সম্পর্কিত। পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা অর্থাৎ সারা বছরব্যাপী নিশ্চিত খাদ্য সরবরাহের বিষয়টি শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার সাথে সরাসরি জড়িত। মূলতঃ এ কারণেই প্রান্তিক গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার সর্বনিম্ন এবং উচ্চস্তর বা সমাজের উচ্চ বিত্ত শ্রেণির সন্তানদের মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তির হার সর্বাপেক্ষা বেশি।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার হার মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে অনেক বড় প্রভাব ফেলে। প্রাথমিক স্তর শেষে মাধ্যমিক স্তরে যত শিক্ষার্থী প্রবেশ করে তার শতকরা ২০ ভাগ সাফল্যের সাথে মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করে।

এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ছেলে শিক্ষার্থীর তুলনায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও নানাবিধ বৈষম্যের কারণে মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করার ক্ষেত্রে ছেলে শিক্ষার্থীরাই তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকে।

প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১৬ অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য কোটা সংরক্ষিত থাকবে। তবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী না পাওয়া গেলে মেধার ভিত্তিতে এই সংরক্ষিত কোটার বিপরীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় অনুপ্রবেশ বা ভর্তির ক্ষেত্রে সুযোগ বঞ্চিত শিক্ষার্থী এবং অনগ্রসর অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য সমসুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূরার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নয় কোন্ প্রতিষ্ঠান?
   ক. বেসরকারি স্কুল
   খ. ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল
   গ. সরকারি স্কুল
   ঘ. কোচিং সেন্টার

২. মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করার ক্ষেত্রে কোন্ শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকে?
   ক. ছেলে শিক্ষার্থীরা
   খ. মেয়ে শিক্ষার্থীরা
   গ. ছেলে ও মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীরা
   ঘ. প্রান্তিক গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা

৩. শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার সাথে কোন্ বিষয়টি সরাসরি সম্পর্কিত?
   ক. রাজনৈতিক নিরাপত্তা
   খ. পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা
   গ. সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা
   ঘ. ভৌগলিক নিরাপত্তা

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. ক, ৩. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী?
২. প্রাথমিক স্তর শেষে মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হ্রাসের প্রধান কারণগুলো কী কী?
৩. মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করার ক্ষেত্রে ছেলে শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে কেন এগিয়ে থাকে?
৪. শিক্ষার বৈষম্য দূর করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে সংক্ষেপে লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।
২. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?

পাঠ ৩.৩: মূল্যযাচাই ও মূল্যায়ন
Assessment and Evaluation

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাধ্যমিক শিক্ষায় মূল্যযাচাই ও মূল্যায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- মূল্যযাচাই ও মূল্যায়নের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক শিক্ষার মূল্যযাচাই ও মূল্যায়নের কৌশলগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

মূলযাচাই ও মূল্যায়ন

শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কার্যসূচী বা শিক্ষানীতি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হল মূল্যযাচাই। মূল্যযাচাই এর মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখনের গুণগত ও পরিমানগত পরিমাপ করা সম্ভব হয়। তাই মূল্যযাচাইয়ের ধারণা থাকা শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে মূল্যযাচাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর সঠিক উন্নতির পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, চারিত্রিক ব্যক্তিত্বের গতিশীল পরিবর্তন ইত্যাদির পরিমাপ এবং শিক্ষণে উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হয়।

মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান মূলক শিখনের দক্ষতা যাচাই করা হয়। আবার লিখিত পরীক্ষার (রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক) মাধ্যমে জ্ঞান মূলক দক্ষতা যাচাই করা হয় এবং নম্বর দেয়া হয়। বিজ্ঞানের এবং অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয়ের পরীক্ষা ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে যাচাই করা হয়। শ্রেণি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনোযোগ, দলীয় কাজে সহযোগিতা, নেতৃত্ব দেয়া, অস্থিরতা বা চঞ্চলতা ইত্যাদি যাচাই করা হয় কিন্তু উত্তম, ভাল, মনোযোগী, চঞ্চল, শান্ত ইত্যাদি সাধারণ মন্তব্য করা হয়। এ জন্য কোন নম্বর দেয়া হয় না বা গ্রেড নির্ধারণ করা নেই।

শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপ করার জন্য মূল্যায়নের বিকল্প নেই। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বর্তমান অবস্থান নির্ধারণ করা যায়। তবে মূল্যায়ন বা পরীক্ষার পদ্ধতির ত্রুটিবিচ্যুতি ও সমস্যাবলী সম্পর্কে মূল্যায়নকারীকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থী যোগাযোগ, নিয়ন্ত্রণ, কার্য-স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিশেষ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে থাকে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এসব দিকগুলোর প্রতি ও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যার সাহায্যে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষার্থী কতটা সফল হয়েছে তা নিরুপিত হয়। শিক্ষার্থীর আচরণের যে দিকগুলো তার সার্বিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে শিক্ষাবিদগণ চিহ্নিত করেছেন সেগুলো হলো– জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত, অনুভূতি সম্পর্কিত ও মনন সম্পর্কিত। এই তিন প্রকার আচরণের মধ্যে আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমটি মূল্যায়ন করা হয়। এটি আরো কার্যকরভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর অন্য দুটি দিক ও যাচাই করার জন্য যথাযথ নিয়মনীতি তৈরি করা আবশ্যক। পরীক্ষা ও মূল্যায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- মুখস্ত বিদ্যা নয় বরং শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্থ করতে পেরেছে তা মূল্যায়নের লক্ষ্যে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা।
- পরীক্ষা ও মূল্যায়নের স্তর, পদ্ধতি এবং সকল ধারার জন্য অভিন্ন কৌশল অনুসরণের নিয়মনীতি নির্ধারণ করা।
- যথাযথ মূল্যায়নের জন্য পাঠ্য পুস্তক, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার নিয়মকানুন নির্ধারণ এবং প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের তা বুঝতে পারার উপায় নির্ধারণ এবং তাদের সচেতন করা।

মূল্যায়নের কৌশল

শিক্ষানীতি- ২০১০ অনুসারে মূল্যায়নের যে কৌশলগুলো রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ–

১. শিক্ষার সকল স্তরে জ্ঞানার্জন মূল্যায়ন যাতে যথার্থ হয় সেদিকে যথাযথ নজর দেয়া হবে। পরীক্ষা পদ্ধতিকে আরো কার্যকর করা হবে।

২. ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের অনুভূতি ও মনন সম্পর্কিত বিকাশ মূল্যায়ন করার পদ্ধতি নিরুপণের ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে।

৩. প্রচলিত পদ্ধতিতে মূলত: মুখস্থবিদ্যা মূল্যায়িত হয়। এটি প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারে না। আসলে মুখস্থবিদ্যা নয় বরং বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্থ করা হয়েছে তার মূল্যায়ন করা গেলেই শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ন করা হবে। বর্তমানে যে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে সেটি আত্মস্থ করা বিদ্যালয় মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ নির্ভর করবে উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল রেখে যথাযথ পাঠ্য পুস্তক, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার সময় নিয়মকানুন নির্ধারণ করা এবং প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলে তা যথাযথভাবে বুঝতে পারার ওপর। কাজেই যথাযথ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, নিয়ম-কানুন নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সচেতনতা ও জ্ঞান সৃষ্টি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার মূল্যায়ন

আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগে অনেক বেশি নতুনত্ব আনয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর অর্জিত দক্ষতার মূল্যায়ন তথা পরিমাপকরণের তাগিদে সমাপনী পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতার বর্তমান অবস্থা পরিমাপ করা যায়। জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ–

- অষ্টম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই পরীক্ষার নাম জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (J.S.C) পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। সকল পরীক্ষায় মুখস্থকে নিরুৎসাহিত করা এবং সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়। অষ্টম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হয়।
- যে সকল শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে না, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের একটি কোর্স সমাপ্তি সনদপত্র প্রদান করবে এবং শিক্ষার্থীর আন্ত:পরীক্ষা ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল জন্ম তারিখসহ উক্ত সনদপত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে।
- নবম হতে দ্বাদশ শ্রেণি অথবা সমমান পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক এবং মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়।
- দশম শ্রেণি শেষে জাতীয় ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই পরীক্ষার নাম মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (S.S.C) এবং পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হয়। দ্বাদশ শ্রেণি শেষে আরো একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর নাম উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (H.S.C)

পরীক্ষা। উভয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সৃজনশীল পদ্ধতিতে এবং পরীক্ষার মূল্যায়ন হয় গ্রেডিং পদ্ধতিতে। উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে।

- মাদরাসার ক্ষেত্রে জুনিয়র দাখিল, দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় সকল ধারার জন্য আবশ্যিক বিষয়সমূহে অন্যান্য ধারার সঙ্গে অভিন্ন প্রশ্নপত্র অনুসরণ করা হবে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবহারিক পরীক্ষার যথাযথ মূল্যায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষায় কোনো শিক্ষার্থী এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তাকে সে বিষয়ে/বিষয় দুইটিতে দুইবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিবর্তিত হলে পুরাতন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী উক্ত প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে, তবে কোনো অন্তবর্তীকালীন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাবে না। [সূত্রঃ জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০]

তবে জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০১২-এর মান-যাচাই ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। এতে বলা হয় বাংলাদেশে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত দু'টি ক্ষেত্রের মধ্যে একটি হলো বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধি বৃত্তীয় ও মনোপেশীজ ক্ষেত্র আর অপরটি হলো আবেগীয় ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন। প্রত্যেক বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দ কৃত নম্বর হল– ২০%।

প্রতিটি বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নম্বর নিম্নরূপ–

ক্ষেত্র	**নম্বর**
ক. শ্রেণির কাজ	১০
খ. বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ	০৫
গ. শ্রেণি অভিক্ষা	০৫
মোট =	**২০**

প্রতি বিষয়ের বিষয় শিক্ষক কর্তৃক প্রতি শিক্ষার্থীকে ২০ নম্বরের প্রাপ্ত নম্বর নির্ধারিত ছকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করতে হবে। সংরক্ষিত নম্বর অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যুক্ত করে চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর আচরন ও মূল্যবোধের ভালো দিকগুলো নিয়মানুবর্তিতা, দেশপ্রেম, নেতৃত্ব, সততা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহিষ্ণুতা, সচেতনতাও সমমানুবর্তিতা এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রয়োজন তা উল্লেখপূর্বক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে মন্তব্য করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষানীতি- ২০১০ অনুসারে, মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন্ বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে?
   ক. সকল শিক্ষার্থীকে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানো
   খ. সকল পরীক্ষায় মুখস্থকে নিরুৎসাহিত করা
   গ. মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা
   ঘ. সামগ্রিকভাবে পরীক্ষার ফলাফল ভালো করা

২. সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করার মূল লক্ষ্য হচ্ছে–
   ক. শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু কতটুকু মুখস্ত করতে পেরেছে তা জানা
   খ. শিক্ষার্থীকে যে কোন বিষয়ে/ঐ বিষয়ে অধিক নম্বর পেতে সাহায্য করা
   গ. শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুকে কতটা আত্মস্থ করতে পেরেছে তা জানা
   ঘ. শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন পদ্ধতিতে আকৃষ্ট করা

৩. শ্রেণি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কোন্ বিষয়কে যাচাই করা হয়?
   ক. জ্ঞানমূলক দক্ষতা
   খ. মনোযোগ ও যোগাযোগ দক্ষতা
   গ. ব্যবহারিক দক্ষতা
   ঘ. আবেগিক দক্ষতা

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মূল্যযাচাই বলতে কী বোঝায়?
২. মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলি কী কী?
৩. সৃজনশীল পদ্ধতির সাথে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রধান পার্থক্য কী?
৪. শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যযাচাই কেন গুরুত্বপূর্ণ?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাধ্যমিক পর্যায়ে মূল্যযাচাই ও মূল্যায়নের কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।
২. জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ অনুসারে মাধ্যমিক পর্যায়ের মূল্যায়ন সম্পর্কে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

পাঠ ৩.৪: মাধ্যমিক শিক্ষায় নবতর পরিবর্তন বা সংযোজন
Innovations in Secondary Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে নবতর পরিবর্তন ও সংযোজনগুলি বিবৃত করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় সংযোজনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে নবতর পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সংযোজন। বর্তমানে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ICT নীতিমালার আলোকে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'ICT Based Content' তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২১ অর্জনের লক্ষ্যে (Mission 2021) শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের ১১৯০টির অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে এবং সকল শিক্ষকদের কম্পিউটারসহ ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে আরো আধুনিক ও দক্ষ করে গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) এবং CIDA-এর আর্থিক সহায়তায় শিক্ষক নিবন্ধীকরণ ও প্রত্যয়ন পদ্ধতি (Teacher Registration and Accreditiation System) প্রবর্তন করেছে। জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধীকরণ ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ বা NTRCA একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে পাসকৃত শিক্ষকদের একটি সার্টিফিকেট প্রদান করে যেটি সরকার অনুমোদিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। পূর্বে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সহকারি শিক্ষক ও বেসরকারি কলেজ বা মাদ্রাসার প্রভাষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতো। অনেক সময় অযোগ্য প্রার্থীদেরও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হতো দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে। বিশেষত: এ কারণেই যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে ২০০৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি কর্তৃপক্ষ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াটি পূর্বের তুলনায় আরো একটু ভিন্নতর হয়েছে।

বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ নতুনভাবে শুরু হয়েছে। সম্প্রতি NTRCA শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রকাশ করেছে এবং চূড়ান্ত মেধা তালিকা অনুযায়ী বাছাইকৃতদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিজ নিজ এলাকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের প্রক্রিয়াটি চলমান যেটি মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন বলেই বিবেচিত।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের পাঠদানের যোগ্যতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকদের মান ও পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ পূর্ব থেকেই বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রকল্প চলমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য Teaching Quality Improvement in Secondary Education Project (TQI-SEP) যার মূল লক্ষ্যই ছিল Quality Teacher অর্থাৎ যোগ্য ও দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষক গড়ে তোলা। এ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ–

- NTRCA বা 'জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধীকরণ ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ'-কে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সাহায্য করা, যার ফলে বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আরও দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়। ফলশ্রুতিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রিক মান বৃদ্ধি পায়।
- মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি অচ্ছেদ্য ও শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যার ফলে পরবর্তীতে সমগ্র দেশব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষণ শিখন পরিবেশ আরও উন্নততর হয়।
- শিক্ষকদের কর্মপূর্ব ও কর্মকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করা এবং
- শিক্ষকদের ধারাবাহিকভাবে পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এভাবে সমগ্র মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করা।

[সূত্রঃ Secondary Education Regional Information Base: Country Profile-UNESCO, Page-18]

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর প্রজেক্ট কর্তৃক মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি উন্নয়নে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা করে থাকে। এ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন এর পাশাপাশি পরীক্ষা পদ্ধতিতে সৃজনশীল প্রশ্নের নবতর জ্ঞান প্রয়াসে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে চলছে। তাছাড়া বাংলাদেশে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী জনশক্তি সৃষ্টির জন্য শিক্ষাক্রমে নতুন নতুন বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে– জলবায়ুর পরিবর্তন, তথ্য প্রাপ্তির অধিকার, প্রজনন স্বাস্থ্য, জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ইত্যাদি।

তাছাড়া শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিখনকে সহজবোধ্য, আনন্দদায়ক ও শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক করে তোলার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (a2i) প্রোগ্রাম কর্তৃক উদ্বাবিত "মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও শিক্ষক কর্তৃক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি" কর্মসূচি শিক্ষার আধুনিকায়নে দুটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন যা মাইলফলক হয়ে থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জাতীর শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ কি ধরনের সংস্থা?
   ক. সরকারি
   খ. বেসরকারি
   গ. ব্যক্তি মালিকানাধীন
   ঘ. স্বায়ত্তশাসিত

২. মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বশেষ সংযোজন কোনটি?
   ক. গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল প্রদান
   খ. ডিজিটাল কনটেন্ট (Digital Content) তৈরি
   গ. শিক্ষক প্রশিক্ষণ
   ঘ. সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রণয়ন

৩. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়?
   ক. কম্পিউটার দক্ষতা
   খ. শিক্ষক নিবন্ধীকরণ সার্টিফিকেট
   গ. কারিগরি দক্ষতা
   ঘ. শিক্ষাগত যোগ্যতা

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. খ, ৩. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নতবর সংযোজন কী?
২. শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?
৩. মাধ্যমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রকল্পগুলো কতটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে?
৪. শিক্ষকদের মানোন্নয়ের লক্ষ্যে সরকারের কি ধরনের নতুন পরিকল্পনা রয়েছে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ICT নীতিমালা অনুযায়ী কিভাবে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে?
২. বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নবতর সংযোজনগুলো করা হয়েছে সেগুলো শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতিতে কতটা সাহায্য করবে বলে আপনি মনে করেন? সে সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

পাঠ ৩.৫: মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়ন
Planning, Management and Financing of Secondary Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাধ্যমিক শিক্ষায় পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিবৃত করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক শিক্ষায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ভূমিকা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের উৎসগুলি সনাক্ত করতে পারবেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সকল মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এর শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ নির্ভর করে শিক্ষার পরিকল্পনা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা প্রশাসনের উপর। শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন এবং নাগরিকগণের জন্য শিক্ষা সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য যথাযথ কর্মসূচি এবং প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের স্বক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা প্রশাসনকে আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ, গতিশীল, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ এবং ফলপ্রসূ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের শিক্ষা পদ্ধতি মূলত: পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় সরকারের দুইটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে– (১) শিক্ষা মন্ত্রণালয় (২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ দুটি মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত রয়েছে অনেকগুলো বিভাগ, অধিদপ্তর ও বেশ কতকগুলো স্বায়ত্ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধানত: মাধ্যমিক পর্যায়, উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে এবং মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিষয়ের নীতিমালা তৈরি, পুর্নগঠন, পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন এবং বাস্তবায়ন করে থাকে। [সূত্র: "Secondary Education- Regional Information Base" UNESCO]

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরেই মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের। এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম সংগঠন ও অঙ্গ অধিদপ্তর। মাউশি (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর) মূলত কেন্দ্রীয় পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠান। তবে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে অঞ্চল ও জেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন বিস্তৃত রয়েছে। এর প্রধান ভূমিকা হল মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করা। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণের দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব মাউশি'র।

পরিকল্পনা

মানসম্মত শিক্ষা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া, শ্রেণিকক্ষ স্থাপন, নতুন ভবন নির্মাণ, উপজেলা আই.সি.টি ট্রেনিং রিসোর্স সেন্টার, অনগ্রসর শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন স্থাপন, প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য র‍্যাম্প তৈরি, মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক অব্যাহত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রমে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলেও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর উক্ত পরিকল্পনার প্রণয়নে নীতি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সার্বিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাই এই সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম।

মাউশি'র সাংগঠনিক কাঠামো

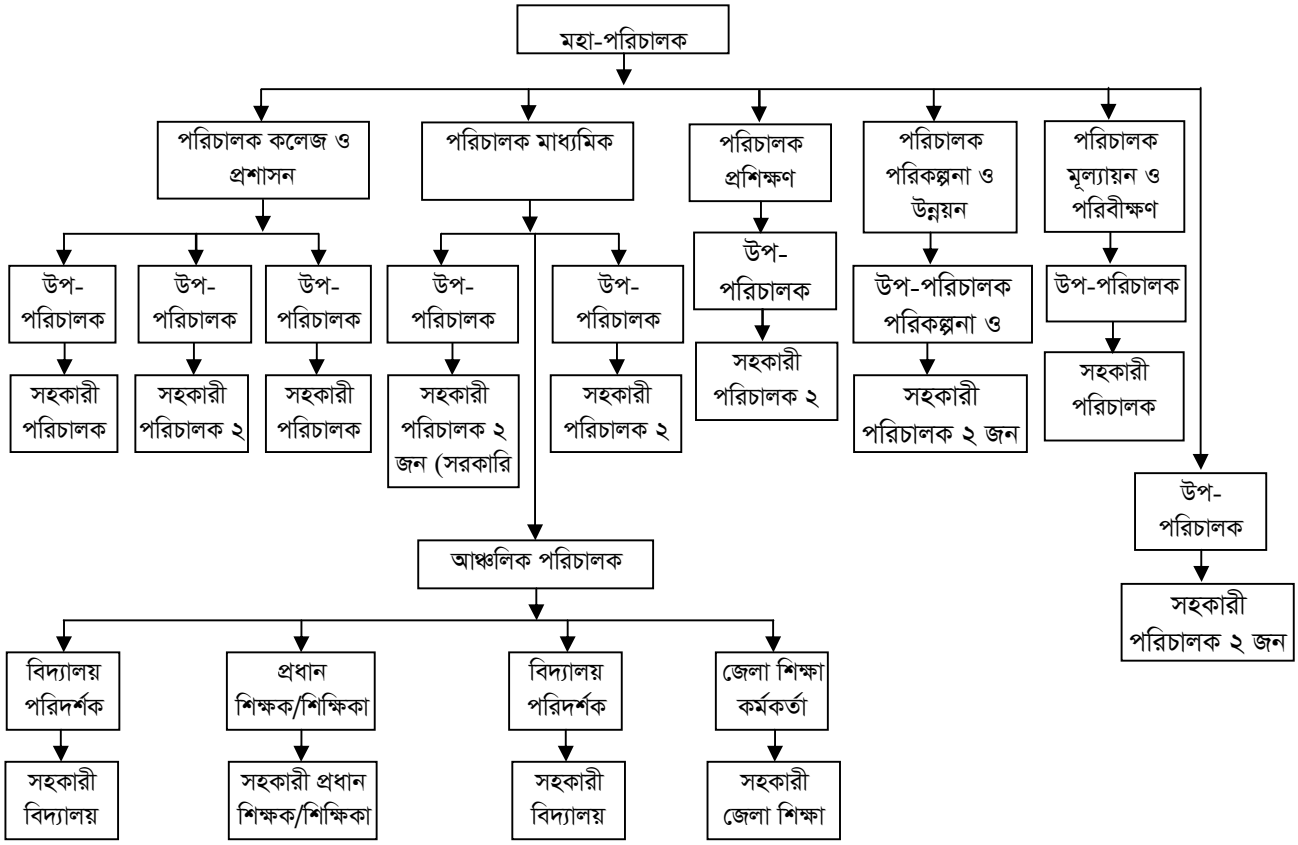

ছক: মাউশি এর প্রশাসনিক কাঠামো।

"মাউশি'র ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ শাসনামলে এদেশের বিদ্যালয় শিক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থাৎ বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা নির্ধারণ, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নিরূপন ও বণ্টন, পারস্পরিক যোগাযোগ ও দক্ষতার সাথে কার্য-সম্পাদনের লক্ষ্যে ১৮৫৪ সালের উডস এডুকেশন ডেসপ্যাচের সুপারিশের ভিত্তিতে জন শিক্ষা পরিচালক বা ডি. পি. আই অফিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই অধিদপ্তরের গোড়াপত্তন। কালক্রমে বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থার মধ্য দিয়ে ১৯৮০ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এঁকে পুর্নগঠিত করা হয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সৃষ্টির পাশাপাশি মাউশি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।

মাউশি'র নির্বাহী প্রধান হলেন মহাপরিচালক। মহাপরিচালকের অধীনে এই অধিদপ্তরের চারটি প্রধান শাখা রয়েছে– (১) কলেজ ও প্রশাসন, (২) মাধ্যমিক শিক্ষা, (৩) প্রশিক্ষণ, (৪) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন। প্রতিটি বিভাগে

একজন পরিচালক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এছাড়া মাউশি'র অধীনে 'শারীরিক শিক্ষা' নামে আরও একটি শাখা রয়েছে যার প্রধান হলেন একজন পরিচালক। মাউশি'র কাজকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগে, জেলা এবং উপজেলায় বিভিন্ন শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালিত হয়ে আসছে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সরাসরি মাউশি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যদিকে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মাউশি'র আঞ্চলিক অফিস ও জেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। জেলা শিক্ষা অফিসসমূহ নিয়মিতভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদরাসা ও নব্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়া ও বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসা শিক্ষকদের বেতন বিষয়ক কর্মকান্ড, শিক্ষার সহ-কার্যক্রমিক বিষয়াদি তদারক করে থাকে জেলা শিক্ষা অফিস। মেয়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান, ব্যানবেইস কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি নানাবিধ পরিদর্শন বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

[সূত্রঃ

১. মাউশির সাংগঠনিক কাঠামো (পৃ. ৩৭৪-৩৭৭) মুজিবুর রহমান।
২. চার্ট UNESCO, (পৃ. ৭)।]

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৬ অনুযায়ী, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের নিয়মাবলি নিম্নরূপঃ

১. সকল মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন করে।
২. এই ধারার বিধান সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন, মেয়াদ ও কার্য-পরিধি ও অন্যান্য শর্তাবলী সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত হবে।
৩. শিক্ষা বোর্ডসমূহের বিদ্যমান বিধি বিধান বা ক্ষেত্র বিশেষ সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে সকল বেসরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পরিষদ গঠন করবে।
৪. ব্যবস্থাপনা কমিটি জরুরী পরিস্থিতিতে, স্থানীয় সরকারের সহিত সমন্বয় করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ এবং উহার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। একজন ব্যক্তি একাধিক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসাবে মনোনীত বা নির্বাচিত হতে পারবেন না।
[সূত্রঃ জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১৬]

প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের প্রয়োজনেই বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। এসব বিদ্যালয়ের সিংহভাগই বেসরকারি বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রশাসনের দায়িত্বে রয়েছেন প্রধান শিক্ষক। তিনি বিভিন্ন আইন, কানুন, বিধি, প্রশাসনিক আদেশ, নির্দেশনাবলি ইত্যাদির আওতায় থেকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন।

স্থানীয় জনগণের সক্রিয় এবং দায়িত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ও সরকারি সহায়তার সমন্বয়ে যাতে এসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে সে লক্ষ্যে বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি গঠনের বিধান রয়েছে।

ম্যানেজিং কমিটি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। সাধারণত বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারি নির্দেশ মোতাবেক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয় তাকেই বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি বা School Managing Committee (SMC) বলে। এর সদস্য সংখ্যা ১১ জন। একজন সভাপতি এবং পদাধিকার বলে সদস্য সচিব

প্রতিষ্ঠানের প্রধান আর বাকী ০৯ জন হবেন বিভিন্ন ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচিত সদস্য। এই কমিটির মূল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রতিষ্ঠান প্রধান সহ শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ, পদ মঞ্জুরীকরণ, চাকুরীর শর্তাবলি বাস্তবায়ন, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, ছুটি মঞ্জুর, আর্থিক যোগান, বিদ্যালয়ে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রণয়ন ইত্যাদি।

মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থায়ন

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থায়নের মূল উৎস হচ্ছে সরকার প্রদত্ত অর্থ (Govt. Funding Source)। মাধ্যমিক স্তরের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে বেসরকারি। এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন ভাতাদির প্রধান উৎস হচ্ছে জাতীয় শিক্ষা বাজেট। বৈদেশিক ঋণ এবং অনুদানসমূহ সরকারের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের মাধ্যমেও তত্ত্বাবধায়ন করা হয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারি তালিকাভুক্ত শিক্ষকগণ (Monthly Payment Order)-এর মাধ্যমে বেতন ভাতাদি পেয়ে থাকেন। সাধারণত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নন-এমপিও ভুক্ত শিক্ষকদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব অর্থায়নে বা অর্থের উৎস থেকে তাদের বেতন ভাতাদি প্রদান করে থাকে। বিদ্যালয়ের আয়ের উৎস পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা বা অবস্থানগত কারণে কিছুটা ভিন্নতর হলেও প্রায় সকল বিদ্যালয়ের আয়ের উৎসকে প্রধানতঃ দুটোভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা–

১. আয়ের সরকারি উৎস (Government Source)

- সরকার প্রদত্ত বেতন ভাতা;
- সরকারি আবর্তন অনুদান;
- সরকারি উপবৃত্তি এবং বৃত্তির অর্থ;
- সরকারিভাবে প্রদত্ত উন্নয়ন অনুদান;
- ভবন নির্মাণ বা মেরামতের জন্য প্রদত্ত অর্থ;
- আসবাবপত্র, উপকরণ ক্রয় বাবদ অর্থ;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিপূরণ বাবদ বরাদ্দ অর্থ;
- সরকারিভাবে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সম্মানী: সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প প্রদত্ত অর্থ।

২. আয়ের বেসরকারি উৎস (Non-Government Source)

- শিক্ষার্থী ভর্তি ফি, পরীক্ষা ফি;
- শিক্ষার্থীর মাসিক বেতন;
- শিক্ষার্থীর লাইব্রেরি ফি, জরিমানা ফি ইত্যাদি;
- বিদ্যালয়ের নিজস্ব সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয়;
- পরিত্যক্ত আসবাবপত্র এবং উপকরণ বিক্রয়লব্ধ আয়;
- পত্রিকা, খাতা, ছেড়া বইপত্র বিক্রয়ের অর্থ;
- NGO প্রদত্ত অনুদান;
- স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রদত্ত অনুদান;
- বিগত বছরের বাজেটের উদ্বৃত্ত অর্থ;
- সাময়িক বিবিধ ফি বাবদ আয় ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর বিনিময়ে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান, বিজ্ঞান শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সঠিক পারদর্শিতা অর্জন করে ভবিষ্যতে তারা মানব সম্পদে পরিণত হয়। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঠিক বাজেট প্রণয়ন না করে সারা বছরের যাবতীয় কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদকাল কত দিন স্থায়ী?
   ক. তিন বছর
   খ. চার বছর
   গ. পাঁচ বছর
   ঘ. দুই বছর

২. মাধ্যমিক পর্যায় এবং উচ্চ শিক্ষা বিষয়ের নীতিমালা তৈরি, পরিকল্পনা গ্রহণ, মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে কোন প্রতিষ্ঠান?
   ক. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
   খ. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
   গ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়
   ঘ. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৩. মাধ্যমিক পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন ভাতাদির প্রধান উৎস কোনটি?
   ক. বিদ্যালয়ের নিজস্ব ফান্ড
   খ. জাতীয় শিক্ষা বাজেট
   গ. শিক্ষার্থীদের বেতন
   ঘ. বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার অনুদান

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ, ৩. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?
২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজগুলো কী কী?
৩. মাউশি'র ঐতিহাসিক পটভূমি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৪. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির গুরুত্ব চিহ্নিত করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মাউশি'র ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করুন।
২. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থায়নের উৎস শিক্ষার মানোন্নয়ের ক্ষেত্রে কতটা পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৩.৬: শিক্ষক শিক্ষা প্রোগ্রামসমূহ: চাকুরী পূর্ব ও চাকুরীকালীণ প্রশিক্ষণ/কর্মপূর্ব ও কর্মকালীন প্রশিক্ষণ

Teacher Education Porgrams: Pre-service and In-service Training

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের শ্রেণি বিভাজন করতে পারবেন।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন বিবৃত করতে পারবেন।

শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। সুশিক্ষা ও মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক। শিক্ষকের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য একদিকে প্রয়োজন বিজ্ঞান সম্মত ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা, অন্যদিকে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক, শিক্ষা এবং চাহিদাভিত্তিক যুগোপযোগী পৌন:পুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন করা।

বাস্তব জীবনে যে কোন প্রশিক্ষণের অত্যন্ত তাৎপর্য রয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন শিক্ষককে অনেক বেশী দক্ষ, যোগ্য এবং কর্মউপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। ক্রমাগত প্রশিক্ষণ একজন শিক্ষকের পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় শ্রেণিকক্ষই অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত। শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত উভয় ক্ষেত্রেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ যা গড়ে ৬৭:০১। এ রকম পরিস্থিতিতে একজন শিক্ষকের পক্ষে যে কোন সাধারণ বিষয়ে পাঠদান খুব দুরূহ হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে একজন দক্ষতাপূর্ণ ও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে, বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ১৪টি সরকারি প্রশিক্ষণ কলেজ, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য ৫টি এইচ.এস.টি.টি.আই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য একটি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। ১৪টি সরকারি প্রশিক্ষণ কলেজেই বিএড ডিগ্রি প্রদান করা হয়। কয়েকটি প্রশিক্ষণ কলেজে এমএড ডিগ্রি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষণের মাধ্যমে বিএড ও এমএড ডিগ্রি প্রদান করে। এছাড়া ও ১০৬টি বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সকল মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামসমূহ যথা– কর্মপূর্ব ও কর্মকালীন প্রশিক্ষণসমূহ পরিচালিত ও আয়োজিত হয়ে থাকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে (Under the Directorate of Education)। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (Institute of Education and Research) যেটি পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। বাংলাদেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (TTCs) সমূহ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রধানত: শিক্ষকদের কর্মপূর্ব প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

প্রশিক্ষণের শ্রেণি বিভাগ

প্রশিক্ষণকে নানাবিধভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে এর ধরন, উৎস, ভিত্তি, সময় এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে। সময় অনুযায়ী প্রশিক্ষণকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা–

১. স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ (Short Course Training)
২. দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ (Long Course Training)

আবার কর্ম/চাকুরী এর উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণি বিভাগ করা যেতে পারে–

১. কর্মপূর্ব প্রশিক্ষণ (Pre-service Tranining)
২. কর্মকালীন প্রশিক্ষণ (In-service Training)
৩. সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ (Refresher Training)
৪. প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ (Training of Trainer-TOT)
৫. প্রতিফলন প্রশিক্ষণ (Follow-up Training)
৬. ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ (Cluster Training)

১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'Education Extension and Research Institute' শুধুমাত্র পূর্বে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের এবং নতুন প্রয়োজনে কর্মকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী নামে অভিহিত করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ অনুসারে বর্তমানে যে শিক্ষক শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত, অপ্রতুল ও অনেক ক্ষেত্রে যুগোপযোগী নয়। তাই প্রশিক্ষণের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি শিক্ষকদের শিক্ষাদানে দক্ষতা মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যে সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তা নিম্নরূপ–

- শিক্ষক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের শিখন শেখানো কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।
- শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং সময়ের সঙ্গে যুগোপযোগীকরণে সহায়তা দান।
- শিক্ষকদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি এবং নেতৃত্বের গুণাবলি জাগ্রত করা।
- শিক্ষকদেরকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দেশের জরুরি সমস্যাগুলোর সাথে পরিচিত করা এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত করতে সাহায্য করা।
- শিক্ষকদের আচরনিক দক্ষতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা এবং দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান করে প্রতিশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করা।
- শিক্ষণ শিখানোর জন্য আধুনিক উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন এবং তা ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- নতুন নতুন শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা ও কৌশল বৃদ্ধি করা।
- গবেষণাপত্র তৈরি ও প্রতিবেদন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব অর্জনে সহায়তা করা।
- সমাজের সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতিসত্ত্বা, আর্থ-সামাজিক শ্রেণির শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দিয়ে পাঠদানে উৎসাহিত করা।

- সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা এবং প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের বিশেষ শিখন চাহিদা অনুসারে শিখন সেবা প্রদানের কলাকৌশল অর্জনে সহায়তা করা।
- সমস্যাদি বিশ্লেষণে দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা।
- তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় সকল স্তরের শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করে উন্নত ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এর সর্বোচ্চ অনুশীলনে উৎসাহিত করা।
- দায়িত্ব ও কর্তব্যে সচেতন থেকে কার্য-সম্পাদনের জন্য শিক্ষকদের উৎসাহিত করা।
- গবেষণা কাজে অংশগ্রহণের জন্য আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি এবং গবেষণা কাজে উৎসাহিত করা।

টেবিল: বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো এবং কর্মপূর্ব শিক্ষক শিক্ষা পদ্ধতি:

শিক্ষা স্তর	গ্রেড লেভেল	কর্মপূর্ব শিক্ষক শিক্ষার ধরন	প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
প্রাথমিক	১ম-৫ম	প্রাথমিক শিক্ষায় দেড় বছরের ডিপ্লোমা	প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
মাধ্যমিক	নিম্ন মাধ্যমিক ৬ষ্ঠ-৮ম মাধ্যমিক ৯ম-১০ম	১ বছর মেয়াদী বিএড ২ বছর মেয়াদী বিএড ৪ বছর মেয়াদী বিএড (অনার্স)	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহ ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়
উচ্চ মাধ্যমিক	একাদশ-দ্বাদশ	বাধ্যতামূলক নয়	বাধ্যতামূলক নয়
উচ্চ শিক্ষা	দ্বাদশ +	বাধ্যতামূলক নয়	বাধ্যতামূলক নয়

- কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ফলে যে সকল কর্মকান্ড সম্পাদিত হয় সেগুলো নিম্নরূপ–

➢ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে সমসাময়িক সর্বশেষ জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।
➢ বিভিন্ন পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে সহায়তা করা।
➢ শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শক, শিক্ষা অফিসার এবং অন্যান্য শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন সেমিনার কনফারেন্স আয়োজন করা।
➢ বিভিন্ন গবেষণা জার্নাল, পুস্তিকা এবং এ ধরনের নানাবিধ শিক্ষা সম্পর্কিত প্রকাশনার মাধ্যমে জ্ঞানের বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করা।

❑ কর্মকালীণ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের প্রকারভেদ

কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামসমূহ প্রধানত: তিন প্রকার হয়ে থাকে।

ক. এক সপ্তাহ থেকে দশ সপ্তাহব্যাপী স্বল্পমেয়াদী কোর্স।
খ. এক বছর মেয়াদী বৃত্তিমূলক/কারিগরি বিষয় সম্পর্কিত কোর্স।
গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ অন্যান্য শিক্ষা কর্তকর্তাদের জন্য সেমিনার ও কনফারেন্স।

ক. যে সকল স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স রয়েছে সেগুলো হচ্ছে–

১. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের জন্য 'Study Conference' এবং "প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা";
২. ইংরেজি শিক্ষণ কোর্স;
৩. বিজ্ঞান শিক্ষণ (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক);
৪. চারু ও কারুকলা শিক্ষণ;

৫. বাংলা শিক্ষণ;
৬. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষণ (ভূগোলসহ);
৭. গণিত শিক্ষণ (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক);
৮. কৃষি শিক্ষণ;
৯. যাচাইকরণ ও মূল্যায়ন;
১০. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষণ;
১১. শিক্ষা অফিসার/কর্মকর্তাদের জন্য 'Study Conference';
১২. ধর্ম শিক্ষণ;
১৩. গ্রন্থাগার বিজ্ঞান;
১৪. শারীরিক বিজ্ঞান;
১৫. শারীরিক শিক্ষা শিক্ষণ;
১৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষণ এবং
১৭. স্বল্পমেয়াদী ওয়ার্কশপ যেমন– অডিও ভিজ্যুয়াল শিক্ষা (Audio-Visual Education)।

এ সকল কোর্সের উদ্দেশ্য হলো মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের দেশ ও জাতি তথা সমগ্র মানব কল্যাণ ও উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার ও দায়িত্বশীল কারিগর হিসাবে গড়ে তোলা। সাথে সাথে বিষয়ভিত্তিক পাঠদানে আরো দক্ষ করে তোলা, মূল্যায়ন, মূলযাচাই এবং প্রশাসনিক নানাবিধ জরুরী বিষয়ে যোগ্যতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে উক্ত প্রশিক্ষণগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে সকল ধরনের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য মূলত: একই ধরনের অর্থাৎ দেশ ও জাতি গঠনের ক্ষেত্রে সুদক্ষ করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের সর্বশেষ শিক্ষা আইন শিক্ষানীতি- ২০১৬ সেখানে বলা হয়েছে–

১. মাধ্যমিক স্তরে কর্মরত সকল সরকারি ও বেসরসারি শিক্ষকগণ বাধ্যতামূলকভাবে Bachelor in Education (B.Ed) বা সংশ্লিষ্ট ডিপ্লোমা-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন বা বিএসসি-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন কোর্সের প্রশিক্ষণ নিয়োগ প্রাপ্তির পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করবে।
২. নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকগণ নিয়োগ প্রাপ্তির পাঁচ বছরের মধ্যে বাধ্যতামূলক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন বা Bachelor in Eduation (B.Ed) বা বিএসসি-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন বা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন বা মাস্টার্স-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন বা সমমান ডিগ্রি অর্জন করবে।
৩. সরকারি ও বেসরকারি নিয়োগ প্রাপ্ত নূতন শিক্ষকগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। [সূত্র: শিক্ষানীতি- ২০১৬]

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রশিক্ষণকে সময়ের উপর ভিত্তি করে কয়ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে?
ক. দুই ভাগে
খ. তিন ভাগে
গ. চার ভাগে
ঘ. পাঁচ ভাগে

২. বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় সকল প্রকার প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামসমূহ কোন্ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত ও আয়োজিত হয়ে থাকে?
ক. ঢাকা শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
খ. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
গ. জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী
ঘ. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ

৩. 'বাংলাদেশ এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর বিশেষত্ব হচ্ছে এটি শুধুমাত্র–
ক. কর্মপূর্ব প্রশিক্ষণ প্রদান করে
খ. সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করে
গ. কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করে
ঘ. প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ প্রদান করে

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্য কী?
২. কর্মকালীন প্রশিক্ষণের প্রকারভেদ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মাউশি'র ভূমিকা চিহ্নিত করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষানীতি- ২০১৬ অনুসারে শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব কতটা বাস্তব সম্মত বিশ্লেষণ করুন।
২. "ক্রমাগত প্রশিক্ষণ একজন শিক্ষকের পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে অনুঘটকের কাজ করে"– ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৩.৭: মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান ইস্যুসমূহ ও প্রতিবন্ধকতা Major Issues and Challenges

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাধ্যমিক শিক্ষার ইস্যু ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ সনাক্ত করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান ইস্যু ও প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে বিশদ আলোচনার পুর্বে বিষয় দুটি সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। ইংরেজি Issue শব্দটির অর্থ প্রচলিত সমস্যা বা প্রচলিত প্রসঙ্গ ইত্যাদি। অর্থাৎ বলা যায়, যে সকল আলোচ্য সমস্যাবলির তাৎক্ষণিক সমাধান করা সম্ভব হয় না, এটা প্রচলিতভাবে চলতে থাকে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে পর্যায়ক্রমে সমাধানের প্রচেষ্টা অব্যহিত রাখা হয় তাকেই Issue বলা হয়। প্রতিবন্ধকতা বা Challenge শব্দটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িত। জীবন চলার পথে আমরা অনবরত বিভিন্ন সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হই এবং তার সমাধান করেই এগিয়ে চলি। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে অসংখ্য প্রবিন্ধকতার সম্মুখীন হই যেমন– সামাজিক জীবনে নিরাপত্তার সমস্যা, শিক্ষাঙ্গনে সনাতনী পরীক্ষা ও মূল্যায়নগত সমস্যা, অদক্ষ শিক্ষক আধিক্য, উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়নগত প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি।

একটি বিষয়ে আমরা সকলেই অবগত যে, শিক্ষা একটি চলমান সামাজিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন উপাদান জড়িত অর্থাৎ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী, শিক্ষণ শিখন মূল্যায়ন ইত্যাদি। সুতরাং শিক্ষা ক্ষেত্রে উপরোক্ত উপাদানগুলোর যে কোনটির ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী এবং উচ্চ শিক্ষার পূর্বের স্তর। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর হওয়া সত্ত্বেও সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। এর পেছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি নানাবিধ কারণ জড়িত। এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষাকে সফলতার শীর্ষ পর্যায়ে নেয়া অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়েছে। নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা সৃষ্টি হওয়ার কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতেই পারছে না। মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে সকল প্রবিন্ধকতা ও সমস্যা পরিলক্ষিত হয় সেগুলো নিম্নরূপ–

- **ভৌত অবকাঠামোগত সমম্যা:** উন্নয়নশীল সমাজের শিক্ষার বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভৌত অবকাঠামোগত সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। যে সমস্যাটি সবচেয়ে প্রবল তা হলো শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিমাণ খুব কম। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবাসন বা ধারণ ক্ষমতার তুলনায় শিক্ষার্থীর মাত্রা অত্যধিক হয়ে থাকে। এতে করে মাধ্যমিক শিক্ষা অনেক বেশি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতা, আলো বাতাস, পানি, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পয়:প্রণালী ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।
- **শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে জটিলতা:** মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ ধরনের শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হলেও মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিকুলতার সম্মুখীন হওয়ায় শিক্ষার যথার্থ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দূরূহ হয়ে পড়ে। ফলে শিক্ষা সমস্যাবলী বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে।

- **শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প:** অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর পরামর্শ ও নির্দেশনায় এবং তাদের আর্থিক সহায়তায় নানাবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিচালিত হয়। কিন্তু বাস্তবায়নে বিবিধ অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা এবং সীমাবদ্ধতার কারণে প্রকল্পগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় না। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার মানোন্নয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রকল্পগুলো অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- **আমলাতান্ত্রিক জটিলতা:** আমাদের দেশে প্রশাসনিক কার্য-গতিশীলতা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট মন্থর বলেই দৃশ্যমান হয়। প্রশাসনের প্রায় সকল স্তরেই আমলাতান্ত্রিক জটিলতা রয়েছে যার ফলে কোন কিছুর ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে তার বাস্তবায়ন অনেকটা দূরুহ হয়ে পড়েছে। এতে করে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য দ্রুত পরিকল্পনা করে তার জন্য অর্থ বরাদ্দ এবং কমসূচির বাস্তবায়ন দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়াভুক্ত বিধায় দ্রুত কার্য উন্নতি সম্ভবপর হচ্ছে না।
- **দক্ষ জনবলের অপ্রতুলতা:** আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবলের যথেষ্ট পরিমাণে অভাব রয়েছে। শিক্ষার আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সূচক হল দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল প্রশাসন। এর অপর্যাপ্ততার কারণেই শিক্ষার উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন সফলভাবে সম্ভব হয় না।
- **নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়:** আমাদের নৈতিক ও মূল্যবোধের আদর্শ মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের নয়। যার ফলে সমাজ, রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রেই দুর্নীতির চরম রাহুগ্রাস পর্যবেক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিচালনা পর্ষদ এবং শিক্ষকদের যথার্থ মূল্যবোধ, বিশ্বাস না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথাযথ এবং পরিপূর্ণ শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
- **বারবার সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার পরিবর্তন:** মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে বিভিন্ন সময়ে বারবার বিভিন্নভাবে সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। এর ফলে সুশিখন বাধাগ্রস্ত হয় এবং সঠিকভাবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে গতিশীলতা হ্রাস পায়।
- **সমন্বয়হীন দাতাগোষ্ঠীর শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের চাপ:** আমাদের শিক্ষা উন্নয়ন কার্যের অধিকাংশই দাতা গোষ্ঠীর প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হয়ে থাকে। দাতাগোষ্ঠী তাদের সুবিধা মতো নির্ধারিত ক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত অর্থের বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এতে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পগুলো সমন্বয় রক্ষা করতে পারে না।

এছাড়াও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়। সেগুলো হচ্ছে যথার্থ শিক্ষা গবেষণা ও নির্দেশনার অভাব, শিক্ষা প্রশাসনিক জটিলতা, ঝরে পড়া প্রবণতা এবং সর্বোপরি শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান নানাবিধ বৈষম্য।

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় পর্যায়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনাকরণ, উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন, যথার্থ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সর্বোপরি নৈতিক মানোন্নয়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলির সমাধান করে দ্রুত শিক্ষার উন্নয়ন ঘটানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সময়ের দাবী। কারণ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের সর্বমুখী বিকাশ সাধন করা আমাদের প্রত্যেকের একান্ত দায়িত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান 'ইস্যু' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. সমস্যা
খ. প্রতিবন্ধকতা
গ. প্রচলিত প্রসঙ্গ
ঘ.বিতর্ক

২. কোনটি শিক্ষার উপাদান নয়?
ক. শিক্ষা উপকরণ
খ. শিক্ষক
গ. শিক্ষার্থী
ঘ. কর্তৃপক্ষ

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষা ক্ষেত্রে ইস্যু বলতে কী বোঝায়?
২. বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কী ধরনের ভৌত অবকাঠামোগত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়?
৩. বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পগুলো শিক্ষার মানোন্নয়নে কতটা ভূমিকা রাখছে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৪. শিক্ষা ক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কি ধরনের জটিলতার সম্মুখীন হতে পারে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রধাণত: কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
২. "বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি" শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল প্রতিকূলতা নিরসনে কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখছে তা মূল্যায়ন করুন।